

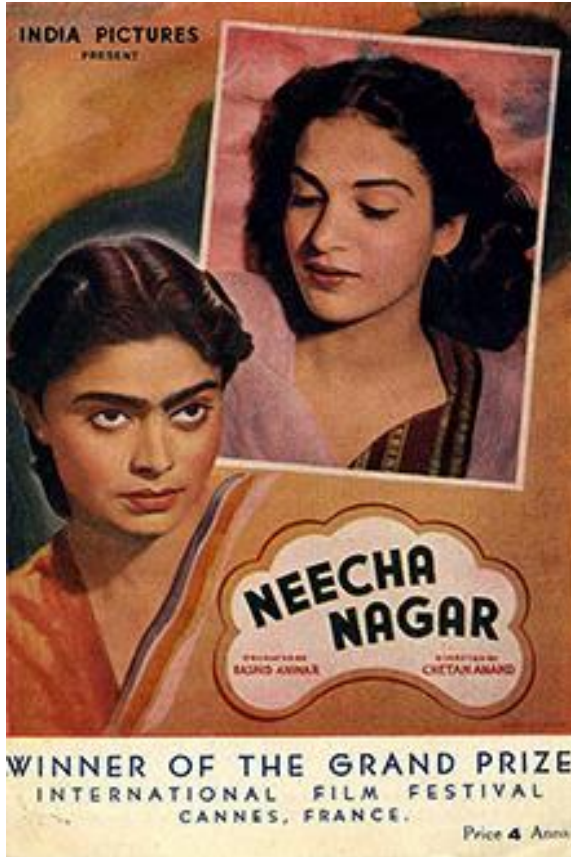
অধরা ধারণাঃ হিন্দি চলচ্চিত্রে সামাজিক ন্যায়ের প্রসঙ্গ, ১৯৪০ থেকে ৭০-এর দশক

নীলশ্রী বিশ্বাস

১৫ মার্চ, ২০২১



হিন্দি চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল যাত্রা, মুজরা এবং তামাশার মত দেশজ বিনোদনের মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। ফলত, যাই তৈরি করা হত তার মধ্যে একটা বড় অংশতেই থাকত নাটকীয় উপাদান এবং বাঁধা ধরা নাচগান। এমনকি যে চলচ্চিত্রগুলি নিজেদের “সামাজিক” বলে দাবি করত – ১৯৪১ সালের *বেহেন*, ১৯৪৩ সালের *পরায়ান ধন*, বা ১৯৪৫ সালের *বচ্পন* – সেগুলির মূল রসই ছিল অতিনাটকীয়তা। এই সময়, কঠোর ঔপনিবেশিক শাসন আর মজ্জাগত সামাজিক বিভাজনে জর্জরিত ভারত তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং এই বৈষম্যগুলি অল্পসংখ্যক কিছু অর্থপূর্ণ, সচেতন চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।



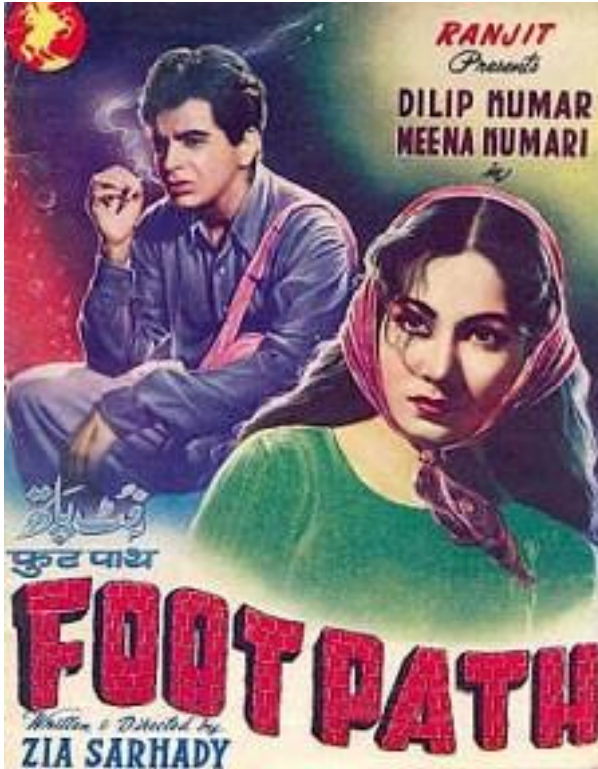
চেতন আনন্দের ১৯৪৬ সালের ছবি *নীচা নগর* (ম্যাক্সিম গোর্কির *দ্য লোয়ার ডেপথস* থেকে অনুপ্রাণিত) এক কাল্পনিক শহরের গল্প। এই চলচ্চিত্রের বিষয় ছিল শ্রেণী নির্যাতন। পরিচালক আনন্দ এবং দুই লেখক হায়াতুল্লাহ আনসারি আর খ্বাজা আহমেদ আব্বাস ছিলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক বৃত্তের অংশ এবং ছবিটির চিত্রনাট্য তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শেরই প্রতিফলন। *নীচা নগর* সেই বছরই কান চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাঁ প্রিঁ দ্যু ফেস্টিভাল, ইন্টারন্যাশনাল দ্যু ফিল্ম (শ্রেষ্ঠ ছবি) জয় করে। *নীচা নগর* ছিল প্রথম ভারতীয় ছবি যা এই পুরস্কার পায়।

পরের কয়েক বছরে, একটি স্বাধীন দেশের আশা ও স্বপ্নকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হতে থাকে। নাগরিক পুরুষ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যায় বা সীমিত ক্ষমতার পটভূমি থেকে উঠে আসা সং আর আপোষহীন যুবক বড় বড় স্বপ্ন দেখে আর জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়। ১৯৪৯ সালে মুক্তি পাওয়া *আন্দাজ*, *জিৎ*, ১৯৫০ সালের *পরদেশ*, ১৯৫১ সালের *হামলোগ*, *নও জওয়ান* আর *সাজ*, এই প্রতিটি ছবিই মূল সূত্র হিসাবে এই অনুভূতির ব্যবহার করে।

তবে, এরা এদের আখ্যানে সমাজের বৈষম্যগুলিকে সম্বোধন করে নি বা সেগুলিকে কাহিনির অংশ হিসাবেও দেখে নি।

কদম কদম পা বাড়িয়েঃ হিন্দী চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে সামাজিক ন্যায়ের দিকে

১৯৫০-এর দশকের শুরুর দিকে, দেশভাগের বেদনা, দারিদ্র এবং ক্রমশ বাড়তে থাকা বেকারত্বের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ করে চলেছিল। যার ফলে, পর্দার চরিত্রগুলি আর আকর্ষণীয় বা মনোহর নয়, বরং তারা হয়ে উঠেছিল সেই সব বিপন্ন মানুষ যারা সমাজের অন্যায়ের শিকার। এই বিপন্ন চরিত্র এবং তাদের যে ধরনের সামাজিক বঞ্চনার মুখোমুখি হয় তার কিছু কিছু দেখা গেছে *ফুটপাথ*, *সুজাতা*, *দিওয়ার* এবং *গমন* ছবিতে।



ফুটপাথ

জিয়া সারহাদির *ফুটপাথ* ছবিটি ১৯৫৩ সালে মুক্তি পায় এবং এর শুরু হয় মূল চরিত্র নশুর একটি স্বগতোক্তি দিয়ে। শহরে কেউ খেতে না পেয়ে মারা যাওয়ার পরে সে বলে, “আমি অবাক হয়ে ভাবি যে কি করে মানুষের কাছে বিষ কিনতে টাকা থাকে কিন্তু চাল কেনার জন্য একটা পয়সাও থাকে না তাদের!” *ধরতি* নামের একটি খবরের কাগজের সাংবাদিক নশুকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলা *ফুটপাথ* এমন একজন নায়কের উপাখ্যান যে বাধ্য হয় কালোবাজারে জড়িয়ে পড়তে। তার এই টিকে থাকার মাত্রাজ্ঞানহীন সফরে, নশু হারায় তার বড় ভাই বানীকে যে মৃত্যুর আগে কোন রকম চিকিৎসার সুযোগই পায় না কারন কালোবাজারের কারবারীরা, আরো মুনাফার লোভে, সমস্ত ওষুধ গোপনে মজুত করে রাখে। ছবির শেষে নশু পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে অপরাধ স্বীকার করে ও পুলিশের হেফাজতে চলে যায় এবং বাইরে তার প্রেমিকা মালা তার অপেক্ষায় থাকে।

আদর্শ নায়কের চরিত্রায়নের দিক থেকে, নশু এক অপ্রত্যাশিত মোড়। তবে, জীবন কোথায় এসে পড়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, এমন একটি চরিত্রকে যে সেই সময়ের দর্শকরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কুৎসিত জাতিভেদ ব্যবস্থার মত গুরুতর ঐতিহাসিক বৈষম্যগুলিকে ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পরিচালকদের অপারগতার মধ্যে এই প্রস্তুত না থাকাই প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু, এর ব্যতিক্রম যে ছিল না এমন নয়।



সুজাতা (১৯৫৯) ছবির একটি দৃশ্যঃ চিত্তামগ্ন সুজাতা এবং তার প্রেমিক কোন কথোপকথন শুরু করার চেষ্টা করছে।

সুজাতা

১৯৩৫ সালের *ধরমাঙ্গা* বা ১৯৩৬ সালের *অশ্রুত কন্যা* ছবি দুটির মত, অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাতের সমস্যা ফুটিয়ে তুলতে প্রথম দিককার প্রচেষ্টাগুলিকে সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর কোন মন্তব্যের বদলে বরং বলা চলে নাটকীয় মোচড়। এগুলির তুলনায়, *সুজাতা* অনেক বেশি সম্ভাবনাময় এবং এর সিনেমাটিক

ট্রিটমেন্ট অনেক নতুন ধরনের। ১৯৫৯ সালে তৈরি এই ছবি সংবেদনার সঙ্গে পরিচালিত একটি পারিবারিক কাহিনি যার বিষয় নিচুজাতের ঘরে জন্মে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে বড় হওয়া এক তরুণীর আত্মপরিচয়ের সংকট।

কাহিনিটি বলা হয়েছে সুজাতার (দলিত নায়িকা) দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এর কাহিনি আংশিকভাবে বাস্তববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আরেকটি শক্তিশালী ব্যতিক্রম হল সুজাতার মা চারুর চরিত্রায়ন – ক্রটিপূর্ণ, মাতৃস্নেহ ও নিষ্ঠুর বিশ্বাস ব্যবস্থার মধ্যে দোলায়মান এবং সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত।

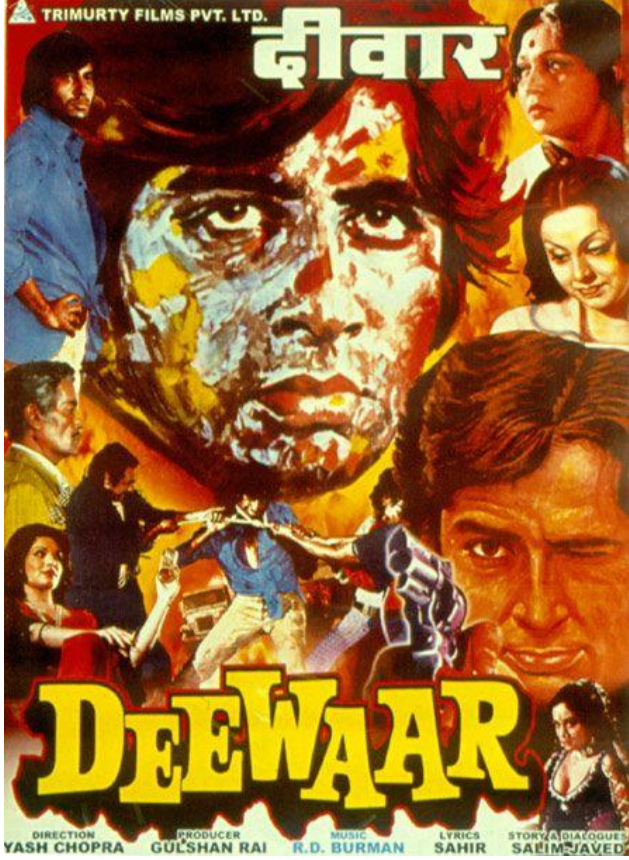
এই ছবিতে দেখা যায়, যেমনভাবে নিজের মেয়ে রমাকে দেখে, সেইভাবে সুজাতাকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে চারু কুণ্ঠিত। চিত্রনাট্য চারুর দ্বিধাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সময় পর্যন্ত যখন দুই মেয়েই প্রাপ্তবয়স্ক আর সুজাতা ভালোবাসা খুঁজে পায় একটি ব্রাহ্মণ পুরুষের মধ্যে যে আবার, ঘটনাচক্রে, গান্ধীবাদীও। সুজাতার বাগ্দত্তকে গান্ধীবাদী হিসাবে দেখিয়ে পরিচালক বিমল রায় কাহিনিটিকে আদর্শবাদের জগতে তুলে আনেন। কাহিনিটি শেষ হয় নিজের বেছে নেওয়া এই ব্রাহ্মণ পুরুষের সঙ্গে সুজাতার বিয়ে হওয়ার মাধ্যমে একই বার্তা দিয়ে। যে ছবি ১৯৫০-র দশকের শেষ বছর মুক্তি পেয়েছে সেই ছবিতে, সিনেমাটিক দিক থেকে দেখলে, এই রকম একটি বিষয়কে মার্জিতভাবে এবং চরিত্রগুলির স্তরে সম্বোধন করাই সম্ভবত ছিল সব চেয়ে ভালো উপায় যা রায় এবং চিত্রনাট্যকার নবেন্দু ঘোষ ব্যবহার করতে পেরেছেন। তবে, পরবর্তীকালে, *অঙ্কুর*, *মহন* এবং *দামুলের* মত নিউ ওয়েভ সিনেমার আবির্ভাবের পর যখন এই একই বিষয়ে নিয়ে পরিচালকরা কাজ করেছেন তখন সেগুলি অনেক জোরালভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর আত্মস্থাপন

১৯৭০-এর দশকের হিন্দি ছবির বিষয় পুরোপুরিভাবেই ছিল অভাবঃ একটি যুদ্ধ, সুদীর্ঘ ছাত্র আন্দোলন, গণবিক্ষোভ, অপ্রতিহত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যাপকহারে বেকারত্ব। স্বাধীনতা পাওয়ার তিন দশকের মধ্যেই, অসংখ্য মানুষ বিপজ্জনকভাবে বাঁচছিলেন, মরিয়া আর ক্রোধে ফুটন্ত। এই বোধগুলিই এক রাগী যুবকের চরিত্রায়নের সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলঃ ১৯৭৫ সালের *দিওয়ারের* লডাকু, সাহসী নায়ক।

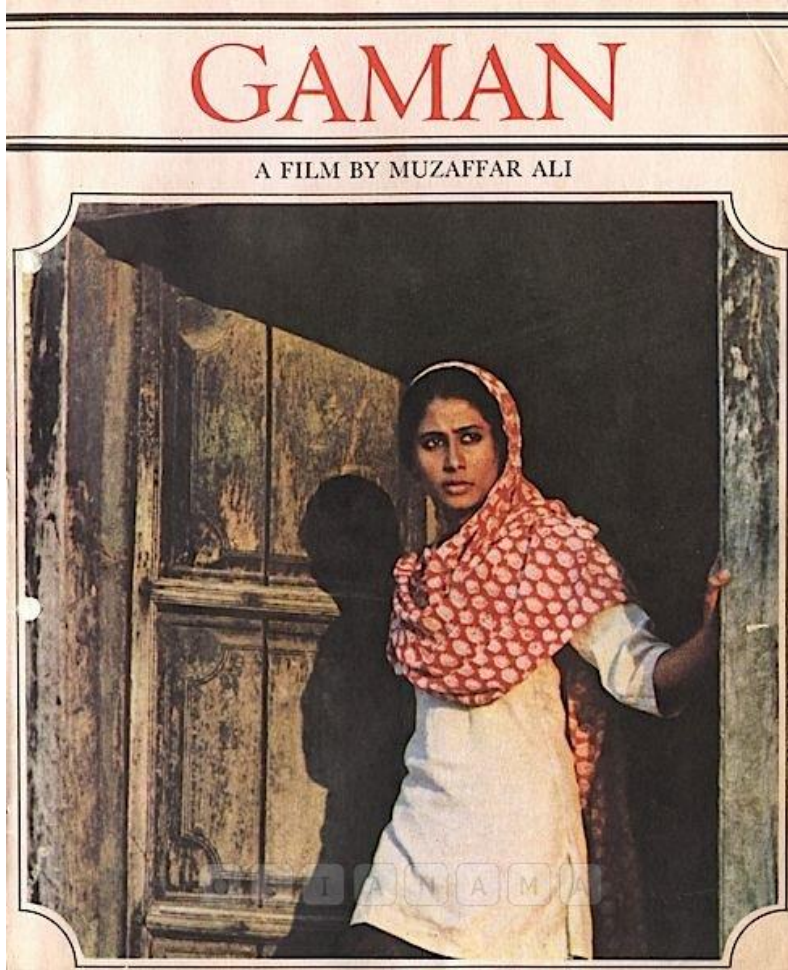
আবারো, *দিওয়ার* ছিল অন্য শ্রেণীর একটি ছবি যা একটি বৃহত্তর দর্শক গোষ্ঠীকে নিশানা করে, সুবিশাল পরিসরে গল্প বলার পথে হেঁটে মূলধারার চলচ্চিত্রের গভীকে ধাক্কা দেয়। এই ছবিটিকে “অন্য ধরনের মূলধারার চলচ্চিত্র” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম আইকনিক ছবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত *দিওয়ার* “নায়ক” চরিত্রের সংজ্ঞাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে। সে হয়ে ওঠে এমন এক নায়ক যে তার পূর্বসূরীদের থেকে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। সংক্ষেপে বলতে গেলে, *দিওয়ার* বিজয়ের গল্প। সেই নায়ক যে তার ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য বাবার ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মা-কে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বন্ধের আবাসন তৈরির কাজে দিনমজুরী করতে দেখে। বড় হয়ে সে পরিণত হয় একজন ক্রুদ্ধ যুবকে যে অকুঠায় হয়ে ওঠে একজন ডন বা অপরাধজগতের মাথা এবং যার মধ্যে থেকে যায় গরীব মানুষের প্রতি বিমুখ তার চারপাশের যে সমাজ তার উপর সুতীব্র ঘণা। সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে আবার নিজের আয়ত্তে আনতে বিজয় যখন বেছে নিচ্ছে চোরচালানের পথ, তারই ছোটো ভাই রবি হয়ে উঠেছে একজন কর্তব্যপারায়ণ, পরিশ্রমী পুলিশ অফিসার।

বস্তুত, ১৯৭৩ সালের *জঞ্জীর* ছবিতেই এই রাগী যুবকের চরিত্রায়নের মেজাজ স্থির হয়ে যায়। এই ছবি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল বলেই পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, যে কোনো উপায়ে শ্রেণীবৈষম্য মুছে ফেলার প্রচেষ্টা আর মাতৃত্বের শুচিতার মতো সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক সমস্যাকে *দিওয়ারে* দেখানো সম্ভব হয়েছে।



এক নজরে দেখলে, *দিওয়ার* অস্থির সম্পর্কের কাহিনি। প্রথমে অনুরক্ত কিন্তু পরে যুযুধান দুই ভাই এবং পরিণামে তাদের বিচ্ছেদ – এই ঘটনার বর্ণনা করে দুই লেখক সেলিম-জাভেদ আর পরিচালক যশ চোপড়া এই সম্পর্কের ভার নিয়ে খেলা করেছেন। এখানে বিজয় পতিত এবং রবি ত্রাণকর্তা এই হিসাবে, নৈতিক দিক থেকে, “ভালো” এবং “মন্দ” যে দুন্দ্ব আছে বলে ধরে নেওয়া হয় সেই দুন্দ্বই তাদের বিচ্ছেদের কারণ। খাদ্য ও সংস্থানের অভাবে ভরা যে জীবন সম্মান দেয় না তার আঘাত – নিজের আশেপাশের পৃথিবীকে উলটে ফেলার আশা করতে করতে বিজয়ের ভিতর যে রাগ ফুটতে থাকে তা আসলে ভারতের হাজার হাজার মানুষেরই নিরন্তর রূপক। ফলত, *দিওয়ার*, আগের মতই আজও একই রকম প্রাসঙ্গিক।

দিওয়ারের পর থেকেই, এই একই বিষয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সাথে অন্যায় হয়েছে এবং ন্যায়ের সন্ধানে তার যাত্রা, নিয়ে ছবি তৈরির একটা ঝাঁক দেখা যায়। অদ্ভুতভাবে, এগুলির মধ্যে অনেক ছবিতেই গল্প বলা বা গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণের বদলে মস্তিষ্কহীন হিংসার উপস্থিতিই বেশি ছিল। তবে, নিউ ওয়েভ সিনেমার পরিচালকরা আরো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা চিন্তা করেছেন, বাহ্য অতিরেক বাদ দিয়ে সেগুলির সঙ্গে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি জড়িয়ে দিয়েছেন। এই রকমই একটি অসাধারণ ছবি মুজফফর আলির *গমন*।



Poster Credit: NFDC/NFAI

পোস্টার ক্রেডিটঃ এনএফডিসি/ এনএফএআই

১৯৭৮ সালে মুক্তি পাওয়া *গমনের* বিষয় গোলাম হাসান এবং লালুলাল তিওয়ারি, উত্তর প্রদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা দুই বন্ধু। লালুলালের পরামর্শে গোলাম বম্বের ট্যান্ড্রাচালক হিসাবে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে যায়। অসুস্থ মা-কে স্ত্রীর দায়িত্বে গ্রামে রেখে সে পৌঁছয় শহরে। যদিও সে তার গ্রামের অসুখী জীবনকে পিছনে ফেলে আসে, কিন্তু বম্বেরে সে কোনক্রমে টিকে থাকে। ছবি শেষ হয় নাগরিক জীবনে ডুবতে থাকা গোলামকে দিয়ে যে আর ফিরে যেতে পারে না।

গমন ছবিটি শ্রমজীবী শ্রেণীর উত্থান এবং তাঁদের অবিরত সংগ্রামকে একটি পরিপ্রেক্ষিতে রাখে। এর বিষয়বস্তু, যা প্রাথমিকভাবে মনে হয় শুধুমাত্র এক কৃষকের ভালোভাবে বেঁচে থাকার সন্ধান, অচিরে তা পরিণত হয় একটি জটিলতর আখ্যান। এই আখ্যান দারিদ্র থেকে উত্থান, গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর এবং কম আলোচিত নাগরিক নিঃসঙ্গতার মত বৃহত্তর প্রশ্নের মোকাবিলা করে। ভূমিহীন কৃষক থেকে শহরের মজুরে পরিণত হওয়া, ভারতের ধ্বংসে যেতে থাকা

অর্থনীতি, বড় শহরের স্বপ্ন, এবং শহরে খেয়েপরে ভালোভাবে বেঁচে থাকার যে অধরা কল্পনা রয়ে যায় বিত্তহীন মনে – এই সব কিছুই এই ছবি মানবিকতার সঙ্গে তুলে ধরে।

এই ছবিগুলি মুক্তি পাওয়ার পরবর্তী দশকগুলিতে, প্রায় বাস্তববর্জিত, কঠোর এবং হিংসাত্মক হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে যায়। একই সঙ্গে, শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হয়েছে, ছোট কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার হারিয়েছে, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা ও লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমশ্য বেড়ে চলেছে। বাস্তব জীবনের দমবন্ধ করা সামাজিক নিপীড়ন ছবির পর্দায় একগুঁয়ে হিংসাত্মক আচরণকে বাড়িয়েই দিয়েছে। ১৯৯০ দশকের মধ্যে, মূলধারার হিন্দি চলচ্চিত্রে তৈরি হতে থাকে এমন সব ছবি যেগুলিতে নায়ক বেপরোয়া খুনজখম করে একা হাতে সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে, যা থেকে আবারো বোঝা যায় ভারতীয় সমাজের সমষ্টিগত বুনট ঠিক কতটা ধ্বসে পড়েছে।

২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া ছবির পরিচালক যেমন অনুরাগ কাশ্যপ (গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর) বসন বাল্লা (পেডলারস) আর অসীম আহলুওয়ালিয়ার (মিস্ লাভলি) হাত ধরে হিন্দি ছবির আখ্যানশৈলী অনেকটা রুক্ষ ও তীব্র হয়ে উঠেছে। পরের বছরগুলিতে দেখা গেছে রজিত কাপুরের *আঁখো দেখি*, ২০১৪ সালে আর ২০১৫ সালে নীরজ ঘেওয়ানের *মাসানা* এই ছবিদুটি ভারতের জটিল জাতপাত ব্যবস্থা এবং অবাধ দুর্নীতি নিয়ে তীক্ষ্ণধার প্রশ্ন তুলেছে। অচিরেই নেটফ্লিক্স এমন সব কনটেন্ট দেখাতে শুরু করল যেগুলির সঙ্গে মিশে আছে সামাজিক ন্যায়বিচারের ঝলক। উদাহরণ হিসাবে সেক্রেড গেমস, ভারতের প্রথম নেটফ্লিক্স অরিজিনাল সিরিজটির উল্লেখ করা যায়। ৮০ আর ৯০-এর দশকের নিউ ওয়েভ সিনেমার পরিভাষা ভেঙে বেরিয়ে আসা, ২০১২ সালে শুরু হওয়া ডেলহি ক্রাইমের মত মহিলাদের উপর দ্রুত বাড়তে থাকা হিংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি ওয়েব সিরিজগুলি এই বিশ্বাস থেকেই উঠে এসেছে। বিনোদনের হাওয়া ক্রমশ যেভাবে নানা স্ট্রিমিং সার্ভিসের দিকে ঘুরে যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, বর্তমান ভারত আর বড় পর্দার ছবিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের সন্ধান দেখতে আর আগ্রহী নয়। তারা বরং তাদের হাতের মুঠোয় থাকা স্মার্টফোনের পর্দার স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেই এই ন্যায়বিচারের সন্ধানকারীদের দেখতে বেশী উৎসুক।

নীলশ্রী বিশ্বাস একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্য ও ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এফটিআইআই) থেকে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। তাঁর পরবর্তী বই, ইরফান নবির সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা, *বেনারস* (নিয়োগী বুকস), বেরোবে ২০২১ সালের গ্রীষ্মে।